রিসালাতে মুহাম্মাদী ও বর্তমান পশ্চিমা বিশ্ব

(বাংলা-bengali-البنغالية)

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শহীদ আ: রহমান

1431هـ - 2010م

islamhouse.com

﴿ الرسالة المحمدية إلى الغرب الحاضر ﴾

(باللغة البنغالية)

السيد أبو الحسن علي الندوي

ترجمة : عبد الله شهيد عبد الرحمن

2010 - 1431

islamhouse.com

রিসালাতে মুহাম্মাদী ও বর্তমান পশ্চিমা বিশ্ব

আমাদের সামনে যখন আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগের নাম আসে তখন চোখের সামনে ভেসে উঠে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের সেই তমসাচ্ছন্ন যুগ। যখন আবির্ভুত হয়েছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । বিকশিত হয়েছিল তাঁর হিদায়েত ও প্রশিক্ষণ। বিশ্ববাসী দেখেছিল তাঁর মুজিযা। জাহেলিয়্যাত শব্দটি কানে আসলেই ভেসে উঠে চোখের সামনে আরব জাতি, তাদের বর্বরতা, লাগামহীন চলাফেরার দৃশ্য। ঐতিহাসিকগণ যার চিত্র তুলে ধরেছেন তাদের গ্রন্থে।

তবে জাহিলিয়্যাত বা মূর্খতা শুধু সে কালের সাথে বিশেষিত নয়, ইসলামের পরিভাষায় যে যুগ অহী ও নবুয়াতি দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত বা নবুওয়তের শিক্ষা ও দাওয়াত পৌছেছে কিন্তু লোকেরা তা থেকে বিমুখ থেকেছে, তাকেও বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়্যাত। সেটা ষষ্ঠ শতকের দিগন্ত- বিস্তৃত বর্বর যুগ হোক বা ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্য যুগীয় বর্বরতা হোক - সাধারণত অন্ধকার যুগ হিসাবে যাকে স্মরণ করা হয়। অথবা বিংশ শতাব্দীর দীপ্তিময় সভ্য ও অগ্রগতির যুগ হোক; আমরা যা অতিক্রম করছি।

আল কুরআনুল কারীমের ভাষায়, বিশ্বে আলোকরশ্মি একটিই এবং তার উৎস একটি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলোকরশ্মি। (সূরা আন নূর, আয়াত ৩৫)

তবে অন্ধকার অসংখ্য আর অগণিত।

যদি আল্লাহ তাআলার আলোকরশ্মিতে দীপ্তি না থাকতো, তাহলে বিশ্বে আধারের কোন সুনির্দিষ্ট ঠিকানা থাকতো না। দেখা যেত মানব জীবনের বাঁকে বাঁকে আধার আর আধার।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

"অথবা (তাদের কর্মসমূহ) গভীর সাগরে ঘনিভূত অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ, তার উপরে মেঘমালা। অনেক অন্ধকার; এক স্তরের উপর অপর স্তর। কেউ হাত বের করলে আদৌ তা দেখতে পায় না। আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না তার জন্য কোন জ্যোতি নেই।" (সূরা আন নূর, আয়াত ৪০)

আল কুরআনুল কারীমে যেখানেই আলো-আধার এর আলোচনা এসেছে, সেখানেই আলো-কে এক বচন আর আধার-কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে : নূর (আলো) আর জুলুমাত (অন্ধকারসমূহ)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আলো বা জ্যোতি একটাই আর অন্ধকারের সংখ্যা অনেক এবং অনেক। ঐ প্রাকৃতিক মেঘাচ্ছন্ন আধারে প্রভাতের উদয় হতো না। যেখানে আলোর স্থান ছিল না, সেখানে প্রদীপ জ্বালালেও তা দীপ্তিময় ও জাগ্রত হত না।

বিশ্ব হত তিমিরাচ্ছন্ন একটি ঘুট ঘুটে কালো সমাধি। যেখানে প্রদীপ জ্বালালেও তা প্রজ্বলিত হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মত যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের থেকে পারে না? এভাবেই কাফিরদের জন্য তাদের কৃতকর্ম সুশোভিত করা হয়। (সূরা আল আনআম, আয়াত ১২২)

এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্য জগতে - যেখানে সূর্য উদিত হয় না শুধু অস-যায়, নবুওয়তের আলোক বিন্দুর ছোঁয়া লেগেছে খুবই কম। ওখানে আসমানী আলোকরশ্মির চিত্রায়নের চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিনিয়ত মানবমস্তিষ্ক প্রসুত আলোকরশ্মি দিয়ে। মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে গ্রীস ও রোমানদের সোনালী যুগ ইতিহাসের এক দীপ্ত অধ্যায়- সন্দেহ নেই। কিন্তু নবীওয়ালা প্রশিক্ষণ ও দিক-নির্দেশনার তুলনায় তা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এক বর্বর যুগ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বা ও গুণাবলির ব্যাপারে ওখানে কোন আলোকরশ্মি বা দিক-নির্দেশনা ছাড়াই যুক্তির ঘোড়া দাবরানো হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুন্দর বলেছেন :

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু মাত্র আন্দাজের অনুসরণ করে।"

বিজ্ঞান ও দর্শনের যে ম্যাজিক ওখানের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা সুবিস্তৃত করেছেন তা কল্পনাপ্রসুত ও বিস্ময়ের দিক দিয়ে প্রাচ্যের বিরল কল্প-কাহিনী মনোহরী ভোজভাজীকেও ছাড়িয়ে গেছে। গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস ও প্লেটোর কথা, দর্শন, দার্শনিকদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণ কোথাও কোথাও ঝলক দিত। তবে তা নবীদের প্রশিক্ষণের তুলনায় বর্ষার ঘন অন্ধকার রাতে জোনাকী পোকার আলোর মতই বিচ্ছুরিত হত। নবীদের কোন কোন শিক্ষা ও বাণী তাদের শ্রুতিগোচর হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু তার সাহায্যে পথ চলার মত সেটা যথেষ্ট ছিল না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেই কথাই প্রযোজ্য:

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

"বিদ্যুৎচমক যখনই তাদের আলো দেয়, তারা তাতে চলতে থাকে। আর যখন তা তাদের উপর ছেয়ে যেত আধার, তখন ঠায় দাড়িয়ে থাকত।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২০)

কি আশ্চর্য! নবী ঈসা আলাইহিস সালামের হেদায়াতের প্রদীপ প্রাচ্যে দু শত শতাব্দী পর্যন-প্রতিকুল পরিবেশের মুকাবেলা করে টিকে থেকেছে কিন্তু পাশ্চাত্যে তা নিসপ্রভ হয়ে গেছে তাঁরই গুণগ্রাহীদের আঁচল ছায়ায়। ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা সংস্কার পাশ্চাত্যে তার

গতি হারিয়ে ফেলেছে। যেখানে খৃষ্টবাদের উত্থান হয়েছিল, সেখানেই শিরক ও প্রতিমা পূজার স্রোতধারা বইতে লাগল। কনষ্টাটিনোপলের সম্রাট ও সেন্ট পলের হাতে তাওহীদবাদী এ ধর্মটি পৌত্তলিক ধর্মে পরিণত হল। খৃষ্টবাদের সেই স্বর্গীয় আলোক বর্তিকা নিষপ্রভ হয়ে যাওয়ার পর পাদ্রীরা ধর্মীয় সমাবেশে প্রজ্বলিত করত কর্পূরের উজ্জল প্রদীপ। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত আলোকবর্তিকার স্থান দখল করে নিল যান্ত্রিক প্রদীপ। আর তারা মনে করতে থাকল, ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক আনীত আলোকবর্তিকা তাদের কাছে যত্নের সাথে আছে বিদ্যমান। মুলত: কত শতাব্দী পূর্বে যে তা হারিয়ে গেছে সে খবর নেই তাদের কাছে।
এতদাসত্ত্বেও এ বাস-বতা স্বীকার করতেই হয় যে, পাশ্চাত্যে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিশ্বাস, পরকালের চিন্তা-চেতনা খৃষ্টবাদেরই ফসল। আসলে আসমানী ধর্ম যতই বিকৃত হোক, আল্লাহ ও আখেরাতের ধারনা শিরা উপশিরায় প্রবাহমান থাকে। খৃষ্টীয় পনের ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে যৌক্তিকতা, বস'বাদ তথা ইন্দ্রিয়পূজার যে বিপ্লব সৃষ্টি হল, পাশ্চাত্য জগতকে তা জড়পূজায় লিপ্ত করে দিল। ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য হয়ে উঠল জড়পূজারী। তাদের জীবনধারার রীতি-নীতি আচর-আচারণে আল্লাহ ও পরকাল আর বাকী থাকল না। আজ এ কথা জোড় দিয়ে বললে বলা ভুল হবে না যে, ইউরোপের ধর্ম খৃষ্টবাদ নয়, বস্তুবাদ। যুগ যুগ ধরে ইউরোপ মূর্তিপূজায় লিপ্ত আর দাবী করছে তারা খৃষ্টধর্মের অনুসারী। তারা অত্যন- আবেগের সাথে খৃষ্টবাদের প্রতি তাদের নিখাদ ভালোবাসা ও প্রেম প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাদের এ নতুন মতাদর্শের গির্জা হল, ফ্যাক্টরী, শিল্প, ব্যবসা, প্রমোদভবন, শরাবখানা। এ গির্জাগুলো সর্বদা থাকে লোকের ভীড়ে আবাদ। আর এ গির্জাগুলোর পাদ্রী-পুরোহিত হল, শিল্পপতি, পুজিপতি, কারিগর, শিল্পী। এরাই সেখানে মর্যাদার পাত্র। তারাই সেখানে পূজিত হয় প্রতি নিয়ত। আর খৃষ্টবাদ থেকে গেল গায়েবী মূর্তির মতই।
পাশ্চাত্যের এ আত্নভোলা জাতির যে সকল পরিণাম বিকশিত হয়েছে, আর হচ্ছে তা তাদের বস'বাদী জীবন দর্শনেরই ফল। পাশ্চাত্য এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে ধারন করেছে অনেক প্রভূ।
এক উপযুক্ত দরবার থেকে মাথা উঠিয়ে - যেখানে মাথা নত করলে সমস- দরবার থেকে স্বাধীন হতে পারত- মাথা ঝুকাতে লাগল সকল দরজায়। এক আল্লাহকে ত্যাগ করার শাসি- হিসাবে তারা লাভ করেছে অসংখ্য প্রভূর দাসত্ব। ফলে গোটা পাশ্চাত্য জগত তাদের হিংস্র থাবার কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। কোথাও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভংগিতে, আবার কোথাও অর্থনীতির দেবতার সুরতে কিংবা কোথাও মনগড়া জীব-বোধের আকারে তাদের উপর চেপে বসেছে এ প্রভূত্ব। যারা তিক্ত করে রেখেছে তাদের আজ্ঞা বহদের জীবনযাত্রা। উপাসনা করছে অহর্নিশ। যার তুলনায় আল্লাহ তাআলার উপাসনা করা উচিত ছিল সহস্র গুণ। এমন কঠোর পরিশ্রম নিচ্ছে তাদের জীবন থেকে যা সাধারণত বোবা প্রাণী বা নিষপ্রাণ মেশীন থেকেও নেয়া যায় না। এমন কঠোর সাধনায় নিয়োজিত রেখেছে তাদের অদ্যাবধি যা কোন দেবতার জন্য নিবেদন করা হয়নি। আল্লাহ ব্যতীত ঐ অসংখ্য প্রভূর অভিসন্ধি ও অভিলাষে রয়েছে প্রচন্ড সংঘাত, আকর্ষণ- বিকর্ষণ। তাদের অসঙ্গত উদ্দেশ্য সাধনে উত্থান ও পতন

হতে লাগল গোটা বিশ্বে। সামপ্রাতিককালের দেশাত্নবোধও একটি বড় দেবতা। সর্বদা যা শোণিত ধারা মানুষের জীবন ভক্ষনের অভিলাষী। এমনিভাবে পেট তাদের আরেক দেবতা। বিংশ শতাব্দীর মানবগোষ্ঠী দিবা-নিশি যার বন্দেগীতে লিপ্ত। তদুপরি সে তার ভক্তদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এই তো মাত্র কিছুদিন আগে স্যার এ্যালউরলাজ তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'অনারস্তর জীবন-যাপন এখন পরিগ্রহ করেছে সপ্নপুরীতে। এখন না জীবনের কোন লক্ষ্য সামনে আছে, না আছে জীবনের বড় কোন পরিকল্পনা। সকলেই রাত-দিন গাধার ন্যায় স্বীয় ফ্যাক্টরী বা অফিসে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। দ্রুত থেকে দ্রুততর যান নির্মিত হয়ে প্রতিটি মুহুর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির হাত-পা যেন চক্কর ও ঘুর্ণনে ব্যতিব্যস্ত।'

আল্লাহ-কে ভুলে যাওয়ার দ্বিতীয় পরিণাম হল আত্নবিস্মৃতি। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা এ বাস-ব সত্যটির বিবরণ দিয়েছেন -

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

"তোমরা তাদের মত হইও না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্নবিস্মৃত করে দিয়েছিলেন।" (সূরা আল হাশর, আয়াত ১৯)

বিংশ শতাব্দীর মানুষ হল আত্নবিস্মৃতির পরিপূর্ণ মডেল। সে একেবারেই ভুলে গেছে তার মূলসত্তা, ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট, পশু ও মানবের পার্থক্য, জীবন ও জন্মলাভের মূল উদ্দেশ্য। সে অবলম্বন করেছে পশুসুলভ, জড়বাদী জীবন পদ্ধতি। রূপান্তরিত হয়েছে টাকা-ডলার তৈরীর একটি মেশীনে। যে নিজে তা থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে না। অন্তত শারিরিক আমোদ-প্রমোদ আন্তরিক প্রশান্তিই তো তার চেষ্টা-প্রচেষ্টার দাবী। কিন্তু তার জীবনে এর জন্যও কোন সুযোগ হয়ে উঠে না। এমনকি এ অনুভূতিটুকুও অনুভব করার যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলেছে।

প্রফেসর জোড যথার্থই বলেছেন- 'সম্প্রতিকালের মানব সমাজের সম্পর্ক হল অগ্রগতির সাথে। অগ্রগতিই ইদানীং কালের যুবকদের উপাস্য। এর আস্তানায় তারা পেতে চায় স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা। অন্যের প্রতি দয়াপরবশ হওয়াকে তারা প্রত্যাখ্যান করে নির্দয়ভাবে।'

বর্তমান বিশ্ব আত্নভোলা পাগলামীতে মানুষের মৌলিক অবকাঠামো বদলে দিয়েছে। সে স্বীয় উন্নতি নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে ভিন্ন লাইনে অগ্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহন করেছে। আসলে সত্যিকার মানুষ হিসাবে সে কোন উন্নতি করেনি। বরং তার মানুষত্বের বৈশিষ্টে ধস নেমেছে। সামপ্রতিক অগ্রগতিগুলো বিশ্লেষণ করলে বের হয়ে আসবে এগুলো হল হিংস প্রাণীর চরিত্র আর বিহঙ্গকুল ও মৎসরাজীর কলাকৌশল।

একজন পশ্চিমা লেখক এ বাস-বতাকে স্বীকার করেছেন এভাবে: 'আমাদের বিস্ময়কর শৈল্পিক বিজয় এবং লজ্জাকর ছেলে মানুষী চরিত্রের যে ব্যবধান, এর কারণে আমাদের জীবনের বাঁকে বাঁকে জন্ম নিয়েছে প্রচুর সমস্যা। আমাদের এ অগ্রগতির রূপরেখাটা হল ; আমরা সমুদ্র পারে বসে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশের মানুষের সাথে কথা বলতে পারছি সহজে। সমুদ্রের উপরে ছুটাছুটি করি আর তার তলদেশে সাতার কাটি। সেলুনে বসে রেডিও মারফত লন্ডনের বড় ঘন্টার ধ্বনি শুনি। আমাদের ফোনগুলোতে কথার সাথে সাথে

আসতে থাকে ছবি। বিদ্যুতযোগে পাকানো হচ্ছে ফসলাদি। তৈরী হচ্ছে রাবারের সড়ক। আধুনিক যন্ত্রপাতির বরকতে আমরা অনায়াসে দেখতে পাচ্ছি শরীরের ভিতরের বিভিন্ন অংশ। বৈদ্যুতিক হিটে চুলে সিঁথি কাটতে শিখেছি আমরা। সামুদ্রিক জাহাজ উত্তর মেরু আর বায়ু জাহাজ দক্ষিণ মেরু পর্যন- উড়ে যায়। এত কিছু সত্বেও আমরা পারি না আমাদের শহরগুলোতে কোন বিস্তৃত ময়দান বানাতে যেখানে অসহায় শিশুরা আরাম আয়েশে খেলাধুলা করবে, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবে।'

ভারতীয় এক দার্শনিকের সাথে নিজেদের সভ্যতার গুণ-কীর্তন করছিলাম এক মোটর চালক সম্পর্কে। সে এক ঘন্টায় তিনশত চার মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে রেকর্ড করেছিল। আমার কথা শুনে ভারতীয় দার্শনিক বললেন, 'হ্যাঁ, কথা সত্য। চড়ুই পাখীর মত তোমরা আকাশে উড়তে পার। মাছের মত পানিতে সাতরাতে জান, কিন্তু মানুষের মত পৃথিবীতে চলতে জান না।'

তাই বলতে হয়, আত্নবিস্মৃতিতে অগ্রসর পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অভিযোগ করে কোন লাভ নেই।

পাশ্চাত্যের আল্লাহ ও পরকাল ভুলে যাওয়ার চিত্র হল - পার্থিব জীব ও জাগতিক বস্তুর স্বাদ আস্বাদন, ভোগ বিলাস এক চরম উম্মাদনা আর অবিচ্ছেদ্য পীড়ায় রূপান-রিত হয়েছে। ভোগ-বিলাসই হল তাদের জীবনের প্রধান টার্গেট। আজ পাশ্চাত্যের পরতে পরতে ধ্বনিত হচ্ছে ভোজন উৎসব ও পানাহারের কলরব। ভেসে আসছে আমোদ-প্রমোদের সুউচ্চ আওয়ায। তারা এ ভোগ বিলাস ও তার উপকরণ অর্জনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। এ প্রতিযোগিতা মানুষকে এক সীমাহীন প্রান-র বানিয়ে দিয়েছে যেখানে তার আত্না বিভ্রান- হয়ে ঘুরে বেড়ায় আপন গৃহের সন্ধানে। এ যেন জীবনের এক তীব্র তৃষ্ণা যা কখনো নির্বাপিত হবার নয়। এক প্রচন্ড ক্ষুধা যা নিবারণ হবার নয়। প্রতিটি মানুষের জানবাজ শ্লোগান একটি: আরো চাই! আরো চাই!! দিন দিন বাড়তে লাগল জীবনের প্রয়োজন। সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল প্রবৃত্তির দাবী পুরনের রকমারি উপকরণ। যা সামাজিক জীবনকে করে তুলল জটিল থেকে জটিলতর। তীব্র হতে লাগল ব্যসায়িক প্রতিযোগিতা। নিজেদের জীবনের মানদন্ড দিন দিন উন্নততর হতে লাগল। অন্যকে পরাস- করে নিজেদের চাহিদার উপকরণ যোগার তাদের নেশায় পরিণত হয়ে গেল। নিজেদেরে লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস, কু-প্রবৃত্তির তাড়না পুরনের এক আজীবন সংগ্রামে হারিয়ে গেল মনজিলে মকসুদের আসল ঠিকানা।

পরকাল অস্বীকৃতি বা পরকাল ভুলে যাওয়ার পর আমোদ-প্রমোদ ও জীবন উপভোগের এ আবেগ - আমরা মুসলিমরা যাকে ছেলেমী মনে করি- সম্পূর্ণভাবে পরকাল অস্বীকার করার ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এ জীবনের পর আকেটি জীবন আছে বলে যারা ভাবতে পারে না, তারা এ জীবনের স্বাদ উপভোগে, আত্নার দাহ নেভাতে কেন ত্রুটি করবে? তারা ভোগ-বিলাস রেখে দেব কোন সুদিনের জন্য? এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

“আর যারা কাফের তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন'র মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।” (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১২)
তিনি আরো বলেন:

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

“ছেড়ে দিন তাদেরকে খেয়ে নিক তারা এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতিসত্বর তারা জানতে পারবে।” (সূরা আল হিজর, আয়াত ৩)
পরকাল অস্বীকার করার দ্বিতীয় পরিণাম হল - দুনিয়া ও তার উপকরণ, দুনিয়ার কর্ম সুসজ্জিত, যৌক্তিক ও বিবেক সম্মত মনে হয়। জন্ম নেয় বস-বাদী মানসিকতা।
আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

“যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজ-কর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছি।” (সূরা আন নমল, আয়াত ৪)
আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেনঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

বল, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস-?’ দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভাল কাজই করছে! ‘তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত (পরকাল) কে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখব না।’ (সূরা আল কাহাফ, আয়াত ১০৩-১০৫)
পরকাল অস্বীকারের আরেকটি পরিণতি হল - জীবনে বাস-বতা আর গাম্ভীর্যতার অংশ খুবই কম। ক্রীড়া কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ আর বিনোদন ক্রিয়ায় কেটেছে জীবনের সিংহ ভাগ। চিত্ত বিনোদনের গ্রাসে চলে যাচ্ছে জীবনের একটি বড় অংশ। এমনকি বড় বড় সঙ্কটপূর্ণ মুহুর্তেও তাদের আনন্দ বিনোদনে কোন ভাটা পড়ে না।
ইরশাদ হচ্ছে -

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

“তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া কৌতুক রূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন তাদের-কে ধোকায় ফেলেছে।” (সূরা আল আনআম, আয়াত ৭০)

পরকাল অস্বীকারের আরেকটি পরিণাম হল- আকষ্মিক ঘটনাবলিতে বাস-ব কারণের প্রতি তাদের দৃষ্টি যায় না। তাদের দৃষ্টি তখন আটকে যায় বাহ্যিক কিছু বস্তুর উপর। তারা পৌছতে পারে না ঘটনার অন-রে। ফলে অত্যন- সংকটময় মুহুর্তেও তাদের আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকতে দেখা যায়। উদাসীনতায় ঘাটতি আসে না তখনো। ঐ আকষ্মিক ঘটনার কোন একটি কাল্পনিক ব্যাখ্যা বের করে শান- হয়ে যায়। কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে না তাদের রীতি নীতি ও জীবন ধারায়।

আল কুরআনুল কারীমে তাদের স্বভাবের কথা আলোচিত হয়েছে এভাবে -

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন কওমের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি তাদেরকে দারিদ্র্য ও দুঃখ দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা অনুনয় বিনয় করে। সুতরাং তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে।" (সূরা আল আনআম, আয়াত ৪২- ৪৩)

পরকাল অস্বীকার করার আরেকটি পরিণাম হল, অহংকার। যাদের অহংকার আর দম্ভ আছে তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না। তারা নিজেদের অনেক বড় কিছু মনে করার কারণে মহা শক্তিশালী সত্তার বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তাহলে তাকে এক লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার মত উদ্ধত হওয়া থেকে রুখতে পারে কিসে? এ জন্য আল কুরআনুল কারীমে আখেরাত অস্বীকারের সাথে সাথে অহংকারের প্রসঙ্গ আলোচ না করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে :

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

"তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। অতঃপর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন-র অস্বীকারকারী এবং তারা অহঙ্কারী।" (সূরা আন নাহল: আয়াত ২২)

এমননি ভাবে পরকাল অস্বীকারকারী, বস'বাদী সমপ্রদায়ের হিংস থাবা, তাদের জুলুম অত্যাচার, আর তাদের বিজয়ী ঔদ্ধত্য সারা বিশ্বে এক ভয়াবহ টর্ণেডো সৃষ্টি করছে।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

"যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালিম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান।" (সূরা আশ শুআরা, আয়াত ১৩০)

এমনিভাবে পাশ্চাত্যবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। যদিও তারা ঈসা আলাইহিস সালাম- কে আল্লাহ তাআলার পুত্র হিসাবে মেনে নিয়েছে কিন্তু তারা তাকে জীবনাদর্শ ও অনুসরণীয় রাসূল হিসাবে মেনে

নেয়নি। জীবনাদর্শ হিসাবে মেনে নেয়াটা ছিল একটি বিশ্বাসগত বিষয়। একে মেনে নেয়ার দ্বারা তাদের জীবন, চরিত্র ও কর্মকান্ডে বিস-র প্রভাব পড়ত। তাদের কাছে মসীহ আলাইহিস সালামের জীবনের মাত্র তিনটি বছরের কর্ম বিবরণ ছিল। তা আবার এমন, যা বাস-বায়ন করা সাধ্যের বাহিরে। পাশ্চাত্য জগত যদি ঈসা মসীহ আ. এর জীবন-চরিত, কথা-বার্তা, পথ-নির্দেশনাকে আদর্শ বানাতে চাইত তাহলে তা তাদের জন্য জটিল হত। কারণ খৃষ্টান পাদ্রীদের কাছে এরূপ কোন বিশুদ্ধ জ্ঞান ভান্ডার ছিল না। যা থেকে একটি জাতির জন্য সুষ্ঠু পথ নির্দেশনা দেয়া যেতে পারত। আবার তারা ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও অন-র্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিল না। যা দিয়ে তারা জাগতিক অগ্রগতির পাশাপাশি তাদেরকে ধর্মীয় পরিমন্ডলে রাখতে পারে। ফলে খৃষ্টান জাতি ঈসা মসীহ ও গির্জার তত্তাবধান থেকে নিজেদের মুক্ত করে বাধা-বন্ধনহীন এমনভাবে জীবন যাপন করতে লাগল, যেন তারা কোন নবীর উম্মত নয়। তারা বঞ্চিত হল চারিত্রিক শিক্ষা ও আত্নশুদ্ধি থেকে যা নবীদের অনুসারীরাই লাভ করে থাকে। তারা জাগতিক উপকরণ সঞ্চয় করেছে প্রচুর কিন্তু আদর্শের কোন পরিবর্তন হয়নি। বস'বাদী জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা তা হতেও পারে না।

পরিণামে এ সকল উপকরণ ও শক্তি যা কল্যাণ প্রবনতার সাথে সাথে যা মানুষের অগ্রগতির কারণ হতে পারত, তা পরিণত হল, নেতৃত্ব, দখলদারি ও সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ারে।

এ আল্লাহ ভোলা পরকাল বিস্মৃতি এবং নবীদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বিমুখতার পরিণাম হল, পাশ্চাত্য আজ এত আলোকিত যে রাত দিনের মত উজ্জল। আর দিন রাতের চেয়েও কালো।

বিগত বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর লয়েড জর্জ বলেছিলেন : ‘যদি আজ ঈসা মসীহ (যীশু) পৃথিবীতে আগমন করতেন, তাহলে বেশীদিন বাঁচবেন না।’ চিন্তার বিষয় হল, দু হাজার বছর পরও মানুষ ফেতনা-ফাসাদ, রক্তপাত, হত্যা, লুন্ঠনে নিয়মিত জড়িত বরং তার ভয়াবহতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি যদি আসেন তাহলে দেখবেন, দেশে দেশে যুদ্ধের প্রস'তি, একে অন্যের জীবন হরণে তৎপরতা, নিপীড়ণ নির্যাতনের রকমারি হাতিয়ার আবিস্কার ও মানুষকে কষ্ট দেয়ার নিত্য নতুন প্রণালী নিয়ে তার অনুসারীরা ব্যস্ত।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রারম্ভে মি. ইডেন বলেছিলেন : ‘বিশ্ববাসী, যতদিন কিছু করা যায়, জানা যায়, করে নাও ও জেনে নাও। কেননা এ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে গুহায় জীবন যাপনকারীরা পৃথিবীর প্রাচীন বর্বর যুগের জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করবে। সুচনা হবে ঐ বর্বর যুগের, হাজার বছর পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল।’

কী বিষ্ময়কর ব্যাপারঃ সমস- দেশ একটি অস্ত্র থেকে বাঁচার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে, যার ব্যাপারে সকলেই ভীত-সন্ত্রস- কিন্তু তাকে আয়ত্তে রাখতে কেউ রাজী নয়। কোন সময় বিস্মিত হয়ে ভাবি অন্য কোন গ্রহ থেকে যদি কোন পর্যটক, তীর্থ যাত্রী এ পৃথিবীতে আসে, এ পৃথিবীকে দেখে তখন কি বলবে? সে দেখবে আমরা সকলে নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ তৈরীতে ব্যস-। আরো মজার ব্যাপার হল, একে অপরকে তার ব্যবহার পদ্ধতিও জানিয়ে দিচ্ছি। আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বের সভ্য জগতের কথা চিন্তা করুন। রোম ও পারস্য সম্রাটদের হাতে ছিল যে সভ্যতার দিক-নির্দেশনা। তা আজকের জগতের সাথে প্রায়

মিলে যায়। তখনও মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আত্নবিস্মৃতিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এক ঐতিহাসিক থিওরীর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মানুষ ঐতিহাসিকভাবে অবশ্য এ স্বীকৃতি দিয়ে আসছিল যে, এ বিশ্ব-ভূবনকে কোন কালে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন।
এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

"আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।"
কিন্তু তাদের বাস-ব জীবন ছিল এ স্বীকৃতির বাস-বায়ন থেকে ভিন্নতর। তাদের কর্মজীবন ছিল এ রূপ যেন আল্লাহ বলতে কেউ নেই। অথবা আছেন, কিন্তু নির্জনতা অবলম্বন করেছেন। বা অন্যদের স্বার্থে সাম্রাজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। জগত জুড়ে এক আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে বহু খোদার পূজা ও উপাসনার মায়াজাল বিস্তৃত ছিল। কোথাও ভূত-প্রেতের অর্চনা ছিল আবার কোথাও সমপ্রদায় বা বংশের। কোথাও বন্দেগী করা হত লালসা ও কামনার। কোথাও বা শক্তি ও ক্ষমতার। কোথাও বাদশা সম্রাটদের বা পাদ্রী সন্নাসীদের। মানুষ ভুলে গিয়েছিল তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। জীবনের সঠিক কর্ম ভুলে গিয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল অনর্থক ব্যস-তায়। শাষকগোষ্ঠী লিপ্ত ছিল নির্যাতন, নিপীড়ণ, বলাৎকার, অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করে রাজত্ব পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ কুক্ষিগত করতে। ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল আমীর ওমরাগণ। তখন জীবন যাপনের মডেল ছিল বহু উন্নত এবং জীবনোপকরণের প্রাচুর্যে ছিল না কোন ঘাটতি। ফলে শাষকগোষ্ঠী নতুন নতুন ট্যাক্স, জরিমানা ও অত্যাচার করেও জীবনের দাবী পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিল।
মধ্য স-রের লোকেরা সর্বদা ব্যতিব্যস- থাকত উঁচু স্তরের মানুষদের তোষামোদ ও অনুকরণে। অসহায় লোকেরা মাথা তোলার সুযোগ পেতনা কোথাও। নির্দেশ পালন, দাসত্ব ও নিত্য নতুন ট্যাক্সের বোঝায় জীবন ভারী হয়ে উঠত। স্বীয় মনিবের ভোগ-বিলাস, তাদের বৈধ-অবৈধ দাবী পূরনের জন্য ভাষাহীন প্রাণীর ন্যায় বন্দি থাকত। যখন তা থেকে কিছুটা ছুটি মিলত, তখন নোংড়া আমোদ-প্রমোদে ডুবে যেত। এভাবেই তারা আত্ন প্রশানি- লাভ করত। ধর্ম, সৃষ্টিকর্তা ও পরকালের চিন্তায় কাটত না তাদের এক শ্বাস পরিমাণ সময়ও। পঙ্কিল শহরের হুকুমতের লালসা ও রাজ্য দখলের উচ্চাকাংখা ছিল তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। পারস্য সম্রাট কোন কারণ ছাড়াই খৃষ্টরাজ্য সিরিয়ায় আক্রমণ করেছে। নব্বই হাজার নিরাপরাধ মানুষের তপ্তলহুতে রক্তাক্ত করেছে আল্লাহর এ জমিন। এর প্রতিশোধ নিল রোম সাম্রাজ্য। একটি নিরাপদ শহরের প্রতিশোধ নিল আরেকটি নিরাপদ শহর দিয়ে। এ রক্তাক্ত যুদ্ধ ধারা বছরের পর বছর চলতে থাকল কোন যুক্তি ছাড়াই। পৃথিবীর দুটো বৃহৎ সাম্রাজ্যের সুসভ্য মানুষগুলো হায়েনার মত লড়ছে একে অপরের বিরুদ্ধে। আঁধার ছেয়ে গিয়েছিল তখন গোটা পৃথিবীতে। আর এর জন্য দায়ী ছিল কোন অসভ্য সমাজ? ইরশাদ হচ্ছে :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

মানুষের কৃতকর্মের দরুন স'লে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা আর রূম, আয়াত ৪১)

তৎকালীন ঘুনে ধরা সভ্য জগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিকটবর্তী স্থানে আল্লাহ পাঠালেন এক উম্মী নবী-কে। যার অবস্থান ছিল সভ্যতার গর্বে গর্বিত দু সাম্রাজ্যের মধ্যখানে অথচ খুব কাছে। তিনি যেন শতাব্দীভর নিপতিত শাসি- থেকে উদ্ধার করেন জগত-কে। আসন্ন পরকাল জীবনের শাসি- সম্পর্কে সতর্ক করেন। সকল প্রকার দাসত্ব থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহর দাসত্ব করতে আদেশ করেন। ছিন্ন করে দেন সকল শিকল, যাতে তারা আবদ্ধ ছিল। তিনি তাদের নির্দেশ দেন সৎকর্মের আর নিষেধ করেন সকল অসৎকর্ম থেকে। যা কিছু পবিত্র ও কল্যাণকর তা হালাল ঘোষণা করেন। যা অপবিত্র ও ক্ষতিকর তা হারাম করে দেন।

সপ্তম হিজরী সনে এই নবী মদীনা থেকে রোম সম্রাট বরাবরে একটি পত্র লিখেন। যাতে আহবান ছিল :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

হে আহলে কিতাবগণ (ইহুদী ও খৃষ্টান সমপ্রদায়) তোমরা এমন কথার দিকে আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি।'

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এ আহবানের সত্যতা বুঝেছে, কিন্তু নিজস্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে এ আহবানে সাড়া দিতে পারেনি। তাদের অনেক শক্তি ও ক্ষমতা থাকলে কোথাও যেন একটি অসহায়ত্ব তাড়া করে ফিরেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এ বার্তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে আরবের নিরুপায়, দুর্দশাগ্রস- সমপ্রদায়। পরিণামে লাভ করেছে তারা দুনিয়ার রাজত্ব। আর ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল দাসত্বের সকল শৃংখল। এক আল্লাহর কাছে মাথা ঝুকিয়ে স্বাধীন হয়ে গেছে সকল রাজদরবার থেকে। না বাকী ছিল প্রবৃত্তির দাসত্ব, না সম্রাট ও সাম্রাজ্যের। না কুসংস্কার, না ভ্রান- প্রথার, না সোসাইটির নিপীড়ণমুলক বন্ধনের।

আল্লাহ তাআলার পরিচয়, তাঁর মহত্ব, বড়ত্ব ভন্ডুল করে দিল পৃথিবীর কৃত্রিম প্রভূদের মহত্বের সব যাদু। ফল হল এই, আরবের ক্ষুধার তারনায় কাতর, ছিন্ন বস্ত্র, পশমী কম্বল পরিহিত মরুচারী, যারা নির্জন মরুভূমি থেকে বেরিয়ে আসত না কখনো, যারা জাঁকজমকের বিকাশ ঘটাতে জানত না, তাদের দেখা গেল অনরাবী সম্রাটের চোখে চোখ রেখে কথা

বলতে। তাদের দরবারে গিয়ে তাদের রানের সাথে রান লাগিয়ে বসতে। শান শওকতের কৃত্রিম প্রকাশ তাদের উপর কোন প্রভাবই রাখেনি।
সাহাবী সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. ইরানের প্রতাপশালী সেনাপতি রুস-মের আহবানে রিবয়ী ইবনে আমেরকে দূত হিসাবে পাঠালেন তারই কাছে। ইরানীরা বেশ জাঁকজমকের সাথে সংসদ সাজিয়েছে। সোনালী তারের কারুকার্য খচিত কার্পেটে রেশমের তুলতুলে নরম বিছানা বিছিয়েছে। ইয়াকুত ও মনি-মুক্তার আলোকছটায় দৃষ্টি প্রায় কেড়ে নিচ্ছিল। স্বর্ণখচিত মুকুট রুস-মের মাথায়। শরীরে স্বর্ণের পরিচ্ছদ আর সোনালী সিংহাসনে সমাসীন।
অপরদিকে ইসলামী বাহিনীর দূত রিবয়ী রা. রাজ দরবারে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, শরীরে মোটা সুতি কাপড়, হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, ঢাল, রানের নীচে হাল্কা ঘোড়াসহ অত্যন-সংকোচহীন ভঙ্গিতে রাজ দরবারে প্রবেশ করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে একজন দরবারী আমীরের চেয়ারের সাথে ঘোড়া বেধে সভায় উপসি'ত হতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে একজন গার্ড তার পথ আগলে ধরল। বলল, হাতিয়ার রেখে দিন। বলিষ্ঠ উত্তর দিলেন রিবয়ী। বললেন, ''আমি স্বেচ্ছায় আসিনি এখানে। তোমাদের আমন্ত্রণে এসেছি। যদি এ অবস'ায় আমার আগমন তোমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে আমি এক্ষুনি চলে যাব।''
সেনাপতি রুস-ম গার্ডকে বলল, আসতে দাও তাকে। রিবয়ী নিজের বর্শা কার্পেটে বিদ্ধ করতে করতে দৃঢ় পদক্ষেপে আগে বাড়তে লাগলেন। কার্পেট বার বার ফুটো হতে লাগল। তিনি রুস-মের পাশে গিয়ে বসলেন। রুস-ম জিজ্ঞেস করল, এ দেশে কি উদ্দেশ্যে আপনাদের আগমন? তিনি জবাব দিলেন স্পষ্টভাবে, ''আল্লাহ তাআলা এক মহান কাজের জন্য আমাদের নিয়োজিত করেছেন। তা হল, আমরা তাঁর নির্দেশে তাঁর বান্দাদেরকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে যাই। পার্থিব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে আখেরাতের প্রশস-তার দিকে আহবান করি। ধর্মের নামে রকমারি নির্যাতন নিপীড়ণ থেকে উদ্ধার করে ইসলামের সাম্য ও ন্যায়নীতির তাবুতে প্রবেশ করাই। তিনি আমাদের স্বীয় ধর্মসহ সকল সৃষ্টিজীবের কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা যেন তার ধর্মের দিকে মানুষকে আহবান করি। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে আমরা চলে যাব। আর যদি তা অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ে যাব। আমরা লাভ করব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার।
রুস-ম জিজ্ঞেস করল, কী সেই পুরস্কার?
বললেন, এ পথে যারা শহীদ হবে তাদের জন্য আছে জান্নাত। আর যারা গাযী হবে তাদের জন্য আছে নুসরত ও সম্মান।
রুস-ম বলল, আমি আপনাদের কথা শুনলাম। আপনি আমাদের কিছু সময় দেবেন কি, যাতে আমরা রাজন্যবর্গের সাথে পরামর্শ করতে পারি?
রিবয়ী রা. বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। কতদিন প্রয়োজন আপনার? এক দিন, দু দিন?
রুস-ম বলল, এতো তাড়াতাড়ি কী করে হবে? রাজধানীতে আমাদের চিঠি-পত্র পাঠাতে হবে, সিদ্ধান- জানতে হবে।

রিবয়ী বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিনের বেশী সময় দেয়ার নজীর রেখে যাননি। তাই এ বিষয় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান- করে ফেলুন আর তিনটি পথের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিন। ইসলাম গ্রহণ করুন নয়তো জিযিয়া কর প্রদান করুন অথবা যুদ্ধের জন্য তৈরী হোন।
রুস-ম বলল, আপনি কি মুসলিমদের নেতা?
রিবয়ী বললেন, না, সমস্ত মুসলমান একটি শরীরের মত। এখানে সকলে সমান অধিকার রাখে।
আরেকবার দূতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলেন সাহাবী মুগীরা ইবনে শোবা রা. । সেদিন পারস্যের রাজদরবার ছিল অভিনব জাকজমকপূর্ণ। ইরানীরা তাদের শান শওকত, দওলত, মহরতের চুরান্ত সমাবেশ ঘটিয়েছিল সেদিন। মুগীরা রা. প্রচলিত রীতিনীতি উপেক্ষা করে সম্রাটের প্রতি অগ্রসর হলেন এবং তার রানের সাথে রান মিশিয়ে বসে গেলেন। ইরানী দরবারীরা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। তারা তার বাহু ধরে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিল। মুগীরা রা. দীপ্ত কণ্ঠে বললেন : অতিথির সাথে এ আচরণ ঠিক হয়নি। আমাদের মাঝে এ রীতি নেই যে একজন খোদা সেজে বসবে আর সকল মানুষ তার সামনে দাসের মত দাড়িয়ে থাকবে।
তার এই বীরত্বপূর্ণ কথা যখন অনুবাদ করা হল, তখন দরবার পিন-পতন নীরবতায় ছেয়ে গেল। এবং তারা তাদের ভুল স্বীকার করল।
সাহাবী মুআজ বিন জাবাল রা. দুত হিসাবে গেলেন এক রোমীয় রাজ দরবারে। সেখানে ছিল স্বর্ণখচিত বিছানা। মুআজ রা. জমিনে বসে গেলেন এবং বললেন, আমি এমন বিছানায় বসতে চাই না যা দরিদ্র, অসহায়দের অধিকার হরণ করে তৈরী করা হয়েছে।
খৃষ্টানগণ বলল, আমরা আপনাকে সম্মান দেখাতে চেয়েছিলাম কিন্তু কি করার, নিজেদের সম্মানের প্রতি আপনাদের কোন খেয়াল নেই।
মুআজ রা. দাড়িয়ে গেলেন, আর বললেন, তোমরা যাকে সম্মান মনে কর তার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। যদি জমিনে বসা দাসদের অভ্যাস হয়ে থাকে তাহলে আমার চেয়ে আল্লাহ তাআলার বড় দাস আর কে?
তাদের একজন জিজ্ঞেস করল: মুসলিমদের মধ্যে তোমার চেয়ে বড় কেহ আছে?
মুআজ বললেন, আমি সর্বনিকৃষ্ট নই। এটাই তো বড়।
রোমানরা তাদের সম্রাটকে নিয়ে গর্ববোধ করতে লাগল। মুআজ রা. বললেন, তার উপর তোমাদের গর্ব এ কারণে যে, তোমরা এম সম্রাটের প্রজা। তোমাদের জান মালের ব্যাপারে তার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমরা যাকে শাসক বানিয়েছি, তিনি কোন বিষয় নিজেকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেন না। যদি তিনি ব্যভিচার করেন, তাকে দোররা মারা হবে। তিনি যদি চুরি করেন, তার হাত কেটে দেয়া হবে। তিনি পর্দার আড়ালে বসেন না। তিনি নিজেকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করেন না। তার সম্পদ আমাদের চেয়ে বেশী নেই।

এ হচ্ছে মানুষের আমূল পরিবর্তন- যারা এক আল্লাহকে প্রকৃত প্রভূ ও উপাস্য মেনে নিয়েছে। বদলে গেছে তাদের জীব আদ্যোপান-। যারা ছিল পশুর দোষে দুষ্ট তারা বনে গেল ফেরেশ্‌তার গুণে গুণান্বিত। যারা ছিল লুণ্ঠনকারী ও ডাকাত, তারাই অন্যের সম্পদে রক্ষাকারী হয়ে গেল। যারা পশুকে আগে পানি পান করার অধিকার নিয়ে বছরের পর রক্তপাতে লিপ্ত ছিল, তারাই নিজের জীবন দিয়ে অন্যকে পানি পান করাল। যারা নিজেদের কন্যা সন-ানদের জীবন- কবর দিত তারাই অন্যের শিশু প্রতিপালনের জন্য নিজেদের কোল খালি করতে লাগল। যারা অন্যের সম্পদকে মনে করত নিজের সম্পদ। তারাই নিজের সম্পদে অন্যের অধিকার আগ্রহ ভরে মেনে নিল।

আল্লাহ তাআলার সন'ষ্টি অন্বেষণ, তাদের দুনিয়া ও রিযক অন্বেষনের উদ্যম ও আবেগকে শেষ করে দিয়েছে। যা পুরো বিশ্বটাকে পরিণত করেছে হাট-বাজারে।

সেই দীনের প্রতি সকল মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলল। পবিত্র বানাল মানুষের ভিতর ও বাহির। সুন্দর করে দিল চরিত্র ও আচার-আচরণ।

মানুষের বিভিন্ন স-রে একে অপর থেকে অগ্রণী হওয়ার প্রতিযোগিতা চলত কিন্তু তা ছিল নেক আমল ও সৎকর্মে।

দরিদ্র সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের দরবারে এসে বললেন : আমাদের মধ্যকার ধনী ভাইয়েরা আমাদের চেয়ে যে আগে বেড়ে যাচ্ছে। নামাজ, রোযা তারা আমাদের মতই করে কিন্তু দান ছদকা করতে পারি না আমরা তাদের মত। দয়াময় রাসূল তাদের একটি জিকির শিখিয়ে দিলেন। এটা আমল করলে তারা ধনীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। ধনীরা তা শুনে ফেলল। তারাও আমল শুরু করে দিল। গরীব সাহাবায়ে কেরাম আবার এসে বললেন, আমরা তো আবার পিছনে পড়ে যাচ্ছি। আমাদের ধনী ভাইয়েরা তো সে আমল করতে শুরু করেছে যা আপনি আমাদের শিখিয়েছিলেন। তিনি তাদের সান-না দিয়ে বললেন, এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করেন।

পার্থিব জীবনোপকরণের প্রতি অনাসক্তি, অল্পে তুষ্টি পার্থিব জীবনকে জান্নাতের মডেল বানিয়েছিল।

ঘরের মালিক প্রাণ-প্রিয় শিশু বাচ্চাদের ভুলিয়ে বালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিভিয়ে দিয়েছে ঘরে চেরাগ। মেহমানকে এ বিশ্বাস দেয়ার জন্য যে, তার সাথে তারাও খাচ্ছে। মেহমান উদার ভরে খেলেন আর মেজবান, তার স্ত্রী, সন্তানাদিরা রাতভর ক্ষুধার্ত থাকলেন। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এ দৃশ্য দেখে চুপ থাকলেন না। বললেন :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।” (সূরা আল হাশর, আয়াত ৯)

এ সব সংশোধন, আদর্শিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য হিসাবে মেনে নেয়ার পরিণামে।

খৃষ্ট জগত এ বার্তার মুল্যায়ন করেনি। প্রাচ্য দেশগুলো এ বার্তা তরিৎগতিতে ধারণ করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ইসলামের আহবানে সাড়া দেয়নি। তারা পূর্ণ নয় শতাব্দী মূর্খতা ও অন্ধকারে কাটিয়েছে। নিজেরাই যাকে অন্ধকার যুগ বলে স্বীকার করত। মানব জীবনের এ সুদীর্ঘ কাল উপহার দিয়েছে কেবল বর্বরতা, মূর্খতা, জ্ঞান-শত্রুতা, প্রবৃত্তি পূজা, পাদ্রী কর্তৃক মানুষকে শোষণ ও শাষকদের নিপীড়ণমূলক খতিয়ান। তাদের এ অধপতনের কারণ ছিল, আল কুরআনের ভাষায় :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের প্রভূ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র।" (সূরা তাওবা : ৩১)

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন তাদের চোখ খুলল, বুঝতে পারল, তাদের সকল বিপর্যয়ের চিকিৎসা হল গীর্জার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। কিন্তু 'লা-ইলাহা' এর পুরো মনযিল তারা অতিক্রম করেনি তখনও। কেবল 'লা কালেমা' কে 'লা-ইলাহার প্রতিশব্দ মনে করেছে। এভাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে সমস- উপাস্যকে স্থান দিয়েছে হৃদয়ে। আর 'ইল্লাল্লাহ' তারা শুরুই করেনি। তাদের উপাস্যগুলোর কোনটির নাম গণতন্ত্র, কোনটির নাম এক নায়কতন্ত্র, কোনটির নাম পুঁজিবাদ, কোনটির নাম সমাজতন্ত্র আবার কোনটির নাম জাতীয়তাবাদ। কিন্তু তাদের কোন মডেল নেই, যার মত করে তারা জীবন সাজাবে।

তারা জীবনের হাজার নকশা প্রণয়ন করেছে এবং হাজার বার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সংশোধন করেছে আর নতুন নতুন নাম দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের প্রতি -যার নেতৃত্ব আজ পাশ্চাত্যের হাতে- রিসালাতে মুহাম্মাদীর মৌলিক বার্তা হল, "হে আল্লাহ থেকে পলায়নকারী, আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। তাকে ছাড়া আর কাউকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করো না।"

ইরশাদ হচ্ছে :

فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿৫০﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿৫১﴾

"অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে দৌড়ে এসো। তাকে ব্যতীত কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (সূরা জারিয়াত, আয়াত ৫০-৫১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বার্তা পৌছে দেয়া হচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান- থেকে অপর প্রান্তে।

নবীগণ মানবিক জাহাজের ক্যাপ্টেন। যুগে যুগে মানুষের নৌকা তাদেরই দক্ষ পরিচালনায় তীরে পৌছেছে।

সমাপ্ত